# বুয়েট থেকে টিএসসি

# বুয়েট থেকে টিএসসি

আনোয়ার পারভেজ শেফীন

TURNING THE PAGE
FOR 15 YEARS

KOBI PROKASHANI

বুয়েট থেকে টিএসসি
আনোয়ার পারভেজ শেফীন

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : মার্চ ২০২৬

প্রকাশক
সজল আহমেদ
কবি প্রকাশনী ৮৫ কনকর্ড এম্পোরিয়াম মার্কেট
২৫৩-২৫৪ ড. কুদরত-ই-খুদা রোড কাঁটাবন ঢাকা ১২০৫

স্বত্ব
লেখক

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

বর্ণবিন্যাস
মোবারক হোসেন

মুদ্রণ
কবি প্রেস ৩৩/৩৪/৪ আজিমপুর রোড লালবাগ ঢাকা ১২১১

ভারতে পরিবেশক
অভিযান বুক ক্যাফে কথাপ্রকাশ ঢাকা বুকস বইবাংলা দে'জ পাবলিশিং বাতিঘর কলকাতা

মূল্য ২৫০ টাকা

Buet Theke TSC by Anwar Pervez Shefin Published by Kobi Prokashani 85 Concord Emporium Market 253-254 Dr. Kudrat-e-Khuda Road Katabon Dhaka 1205 First Edition: March 2026
Phone: 02-44617335 Cell: +88-01717217335 +88-01641863570 (bKash)
Price: 250 Taka RS: 250 US 15 $
E-mail: kobiprokashani@gmail.com Website: kobibd.com

**ISBN** 978-984-2250-01-9

ঘরে বসে কবি প্রকাশনীর যেকোনো বই কিনতে ভিজিট করুন
www.kobibd.com or www.kanamachhi.com
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৬৪১-৮৬৩৫৭১
www.rokomari.com/kobipublisher
অথবা ফোনে অর্ডার করুন ০১৫১৯-৫২১৯৭১ হটলাইন ১৬২৯৭

উৎসর্গ

জীবন, প্রকৃতি, তারুণ্য আর কবিতা ভালোবাসে যারা।

# লেখকের কথা

যখন যা মনে আসে তা হাতের কাছে থাকা কাগজের টুকরোতে লিখে ফেলার অভ্যাস আমার ছেলেবেলা থেকেই। ছোটবেলায় কবিতাই লিখতাম বেশি, সেসময় সেগুলোর কিছু কিছু সংরক্ষণের চেষ্টাও করেছিলাম; কিন্তু জীবনস্রোতের প্রবহমান ধারা বারবার বাঁক পরিবর্তন করায় কখন কোথায় সেগুলো হারিয়ে গেছে তা বুঝতেও পারিনি। ছাত্রজীবনে দেয়াল পত্রিকা আর ক্যাম্পাসভিত্তিক সাময়িকীতে দু-চারটা কবিতা, প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল; এই যা।

এরপর এলো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের যুগ। কর্মজীবনের ব্যস্ততায় কখনো রাস্তায় চলতে-ফিরতে বাসে/ট্রেনে/গাড়িতে/প্লেনে বসে কিংবা ভ্রমণের সময় স্টেশনে/এয়ারপোর্টে/ট্রানজিটে ওয়েটিং লাউঞ্জে বসে আবার কখনো-বা বিজনেস মিটিং করতে গিয়ে ক্লায়েন্টের অফিসে অপেক্ষার সময় মাথার মধ্যে ঘুরপাক খাওয়া কথামালা মোবাইলফোনের ডিসপ্লেতে লিখে ফেলি; পরে সময়-সুযোগ করে স্যোশাল মিডিয়ায় শেয়ার করি। এভাবেই চলছিল গত প্রায় দেড় যুগ। হঠাৎ মনে হলো কিছু লেখা ছাপার অক্ষরে স্মৃতি হিসেবে রয়ে গেলে মন্দ হয় না।

সেই চিন্তা থেকেই বুয়েট, ঢাকা কলেজ আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সময়কালে আর তার কিছুটা আগে-পরে চোখে দেখা পারিপার্শ্বিক কিছু ঘটনা আর উপলব্ধি এই বইটির মাধ্যমে পাঠকের সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি যার অনেকগুলোই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এরই মধ্যে প্রকাশ করেছি বিভিন্ন সময়। এই লেখাগুলো সেই সময়ের শিক্ষার্থীদের মাঝে কিছুটা নস্টালজিক স্মৃতির অনুভূতি তৈরি করলেও করতে পারে, তবে তা এযুগের শিক্ষার্থীদের মাঝে পুরনো দিনের গল্প জানতে কৌতূহলী করবে কি না জানি না!

# সূচিপত্র


বুয়েট থেকে টিএসসি ১১
পুরনো ইতিহাস ফিরে এলে লজ্জা কি তুমি পাবে না, ও বন্ধু? ১৬
আমি দূর হতে তোমারেই দেখেছি ১৯
জন্ডিসাক্রান্ত হওয়ার বদৌলতে কার্জন হলের মায়া ছেড়ে ঢাবিয়ান থেকে বুয়েটিয়ান ২২
আমাদের একজন ড. বসুনিয়া ছিলেন, এখনও আছেন ২৫
ভিতরে বাহিরে অন্তরে অন্তরে ২৮
আমার অনুভবে ৭ কিসিমের মানুষ ৩০
একজন SIC স্যার, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ৩৩
শিক্ষার মান কি ক্রমেই নিম্নগামী? ৩৫
আমি বুয়েটে বিবিএ পড়ি ৩৮
আমাদের নিশাত স্যার ৪২
ঠিকাদার, আদম ব্যবসায়ী থেকে শিল্পপতি ৪৮
আমার দেখা বুয়েটের তিনজন ভাইস চ্যান্সেলর ৫০
বুয়েটে পিএল এর সেই দিনগুলো ৫৫
আজীবন ফেরিওয়ালা ৫৯
বুয়েটে আইবিএ হাইপ ৬৩
কার্জনের দিঘির পাড়ের কালো জাদুর মায়া ৬৭

# বুয়েট থেকে টিএসসি

নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধ, বুয়েটে ভর্তি হবার পর এক বছরেরও বেশি সময় অপেক্ষার প্রহর কাটিয়ে কদিন হলো ক্লাস শুরু হয়েছে, এটাই ছিল তখনকার ট্রেইন্ড। গ্রীষ্ম-বর্ষার তেমনি এক দিনে জুন মাসের রৌদ্রদগ্ধ দুপুর, ক্লাস শেষ হয়েছে সবেমাত্র; হলে ফিরেই নিচতলার ডাইনিং থেকে গোগ্রাসে মধ্যাহ্নভোজন শেষ করে বেশ কয়েকতলা সিঁড়ি বেয়ে নিজের রুমে পৌঁছে স্নান করার পালা। যে গরম পড়েছে তাতে স্নান করাতেই যত আনন্দ, তৃপ্তি আর প্রশান্তি। কখনো-বা বাথরুম-সিংগার হয়ে ওঠা, কখনো-বা ...।

আজ বিকেলে কোনো ক্লাস নেই। তাই ভাতঘুম দেওয়ার কথা ভাবছিলাম, কিন্তু বেশ কয়েকবার নিজের বিছানায় এপাশ-ওপাশ করেও ঘুম আসে না চোখে। চারদিকে কী যেন থেকেও নেই!

ইঞ্জিনিয়ার হতে চেয়েছিলাম, তাই বলে এভাবে? শুরুতেই আচমকা অবিরত ক্লাস-সেশনাল-ক্লাসটেস্ট-অ্যাসাইনমেন্টের এমন পাগলপারা প্রেশার নিতে পারে মানুষ! কেবল সিলেবাসভিত্তিক অ্যাকাডেমিক কার্যক্রমে বুঁদ হয় থাকতে থাকতেই কি পার হয়ে যাবে জীবনের সবচাইতে স্বর্ণালি সময়, বাঁধভাঙা তারুণ্য?

উত্তরের এক জেলা থেকে এসএসসি পাস করে সারা দিনব্যাপী কষ্টসাধ্য সুদীর্ঘ জার্নির ধুলোবালি-ক্লান্তির ধকল সামলে নগরবাড়ি-আরিচা ফেরিঘাট দিয়ে যমুনা পার হয়ে সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ যে ছেলেটি ঢাকায় পৌঁছে ঢাকা কলেজে তার শিক্ষাজীবন শুরু করেছিল নব্বইয়ের দশকের একেবারেই প্রারম্ভে, সেখানে দেড় বছরের খুবই অল্প সময়ের মধ্যে এইচএসসির বিশাল সিলেবাস শেষ করবার অমানবিক চাপে আর হঠাৎ অল্প বয়সে একা রাজধানী শহরে এসে খাপ খাওয়ানোর ধকলে পড়াশুনার বাহিরে আর কিছুই চিন্তা করতে পারেনি সে; অথচ কত কিছুরই না সাধ ছিল তার!

তখনও ছিল এক সামাজিক মনস্তাত্ত্বিক চাপ যাকে বলে পীয়ার প্রেশার যে, এইচএসসিতে ভালো ফলাফল করতে না পারলে জীবন শেষ, কাঙ্ক্ষিত

কোথাও ভর্তি হতে পারবে না। সে অধ্যায় তো পার হয়েছে, আবারও একই পীয়ার প্রেশারের নতুন তত্ত্ব, আন্ডারগ্র্যাডে ভালো ফলাফল করতে না পারলে জীবনটাই বৃথা, পরবর্তী জীবনে সম্মানের সাথে ভালো কিছু করে খেতে পারবে না–এ যেন একই বৃত্তে ঘূর্ণিপাক!

এসব উথাল-পাথাল ভাবতে ভাবতেই আড়মোড়া ভেঙে বিছানা থেকে উঠে পড়লাম, রুমের মধ্যে আর ভালো লাগছে না, হাঁসফাঁস লাগছে, বের হতে হবে; কিন্তু কোথায়? ক্যাজুয়াল কোনো একটা পোশাক পরে উদ্দেশ্যহীন গন্তব্যে বেরিয়ে পড়লাম একাই, অন্য বন্ধুরা যার যার টেবিলে পরের দিনের ক্লাসটেস্টের প্রিপারেশন নিতে আর অ্যাসাইনমেন্ট তৈরিতে ব্যস্ত।

তিতুমীর হলের সামনের গেট দিয়ে বের হয়ে বুয়েটের প্রধান ফটক পেরিয়ে অ্যাকাডেমিক ক্যাম্পাসে ঢুকে কিছুক্ষণের জন্য হাফ ওয়ালে বসলাম, তারপর সেন্ট্রাল ক্যাফেতে বসে এক কাপ চা; এরপর আস্তে-ধীরে সিভিল বিল্ডিং আর ইএমই বিল্ডিংয়ের মাঝ দিয়ে এগিয়ে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিংয়ের সামনে বামে বাঁক নিয়ে আঁকাবাঁকা পথে হাঁটতে হাঁটতে বুয়েটের খেলার মাঠের পাশ দিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বেরিয়ে শহিদ মিনারকে ডানে রেখে জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে সোজা গিয়ে পৌঁছালাম টিএসসি। এ যেন কোনো এক সুশান্ত গ্রামের ছায়া-সুনিবিড়-শান্তির নীড় থেকে মেঠোপথ বেয়ে নিকটবর্তী গঞ্জে পদার্পণ; চারদিকে যেন প্রাণের মেলা, গাছে-গাছে পাখপাখালির কলোরব!

আস্তে আস্তে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামল, এরই মধ্যে দেখা হয়ে গেল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যায়নরত ঢাকা কলেজের আর উত্তরের নিজ জেলার কজন আঞ্চলিক বন্ধুর সাথে। মাঝখানে টিএসসির সামনের ফাঁকা জায়গাটায় দাঁড়িয়ে ছোলা-পেঁয়াজুর সাথে আরও এক কাপ চা। দারুণ এক সন্ধ্যা কাটল, নিজেকে হালকা মনে হলো বেশ! এবার ঘরে ফেরার পালা। তবে ফেরার পথে সাথী হিসেবে বুয়েটের বিভিন্ন হলের পরিচিত আমারই মতো অক্সিজেনের নেশায় পেয়ে বসা আরও কয়েকজনকে পেয়ে গেলাম, গল্প করতে করতে ফুরফুরা মেজাজে নিমিষেই পৌঁছে গেলাম ড. এম এ রশীদ হলে আমার ঘরে।

এদিকে ততক্ষণে সহপাঠীদের পরদিনের ক্লাসটেস্ট আর ক্লাস অ্যাসাইনমেন্টের কাজ শেষ। আবার মনস্তাত্ত্বিক চাপ, আমাকেও শেষ করতে হবে, নইলে কপালে দুঃখ আছে! সেই রাত জেগে পড়া, আর বন্ধুর কাছ

থেকে অ্যাসাইনমেন্টটা নিয়ে কপি করা–এ যেন এক গোলকধাঁধা যেখান থেকে বেরোবার পথ বড়ই কণ্টকাকীর্ণ। পরদিন বিকেলে আবারও টিএসসি, কী যেন এক আকর্ষণ আমাকে টানছিল!

বলে রাখা ভালো, ঢাকার টিউশন বাজারে বুয়েটের পোলাপানদের ছিল হাই-ডিমান্ড; তাই টাকার প্রয়োজন থাকুক বা না থাকুক ১/২/৩টা টিউশন করানো ছিল বুয়েটের পোলাপানদের হালজামানার ট্রেইন্ড। বাসা থেকে মাসে ১২০০/১৫০০ টাকা পাঠাত, বিড়ি ফুঁকার অভ্যাস ছিল না আমার; তাই ওটা দিয়েই গরিবি হালে দিব্যি চলে যেত মাসের খরচ; তবে টিউশনের উপড়ি ইনকাম ছিল না বলে শখ হলেও দামি কোনো ব্যবহার্য সামগ্রী কিনতে পারতাম না, হিরোইজম দেখাতে পারতাম না বন্ধুদের ট্রিট দিয়ে। আর হ্যাঁ, তখনও ইয়ে মানে টিয়ে পাখির সন্ধান পাইনি বলে সেদিকটাতেও বাড়তি খরচা শুরু হয়নি।

প্রতিদিন বিকেলে বুয়েট ক্যাম্পাসের মাঝখানের রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খেলার মাঠ সংলগ্ন গেট দিয়ে বের হয়ে জগন্নাথ হলের পাশ দিয়ে টিএসসি পর্যন্ত রুটটা কেমন যেন আপন-আপন হয়ে গেল, মাঝে মাঝে শামসুন্নাহার হলের মোড়ে ত্রিভুজাকৃতির সড়কদ্বীপে জগন্নাথ হল থেকে বেরোনো কজন বন্ধুর সাথে বসে কিছুক্ষণ আড্ডা; সেটাও খারাপ ছিল না, বয়সের কারণে ওই জায়গাটাও টানত বেশ; দারুণ রঙিন এক ভাইবস ছিল ওই জায়গাটার, কত কিছুই না খুঁজে ফেরা! সব কথা কি যায় বলা?

টিএসসি ছিল মূল কেন্দ্র, যাওয়া-আসার মাঝপথে শামসুন্নাহার হলের সড়কদ্বীপ; তবে কখনো কখনো কলাভবন, মধুর ক্যান্টিন, কার্জন হলেও যাওয়া হতো কিংবা ডাসের বামপাশ দিয়ে আরেকটু এগিয়ে রোকেয়া হলের সামনের রাস্তা ধরে হেয়ার রোড দিয়ে পলাশি মোড় হয়ে বুয়েটের ঘরে ফেরা। কখনো কখনো আবার টিএসসির আড্ডার পার্টটা সংক্ষিপ্ত করে ফেরার পথে নীলক্ষেত হয়ে নিউমার্কেটে একটা ঢু মেরে তবেই না হলে ফিরতাম।

ডিবেট করতাম ছোটবেলা থেকেই, বুয়েটেও করতাম, করতে করতে একসময় তো জাতীয় টেলিভিশন বিতর্ক প্রতিযোগিতায় ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নই হয়ে গেলাম ফাইনাল রাউন্ড জিতে আমি আর আমার দল। কিন্তু কেন যেন ডিবেটকে বড্ড বেশি মেকানিক্যাল আর রোবোটিক লাগত আমার, সাহিত্যের স্বাদ ওখানে পেতাম না। তবে আমার ডিপার্টমেন্ট কিন্তু ছিল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং; আর রোবোট শব্দটা পরিচিত হলেও রোবোটিক্স

নামের সাবজেক্ট তো দূর-কি-বাত, শব্দটিই ছিল বাংলার বাতাসে তখনও আনকোরা, অপরিচিত।

বুয়েটের অনেক ছেলেমেয়ে বিভিন্নভাবে সাহিত্য/সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে ব্যক্তিগতভাবে, বাহিরের কোনো না কোনো প্লাটফর্মের সাথে কিংবা পৌষ-পার্বণের অনুষ্ঠানভিত্তিক স্টেজ-শোতে জড়িত থাকলেও সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কার্যক্রম নিয়মিত অনুশীলনের জন্য কোনো ক্লাব/সংগঠন/প্লাটফর্ম তখনও আনুষ্ঠানিকভাবে বুয়েট ক্যাম্পাসে গড়ে ওঠেনি। ভাবলাম, ছোলা-পেঁয়াজুর সাথে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপের পেয়ালায় চুমুক আর উথাল-পাতাল গল্পগুজবেই কি শেষ হবে আমার এই প্রাত্যহিক টিএসসি অভিযান?

আর বাংলা একাডেমির বইমেলা তো চলে শুধু ফেব্রুয়ারি মাসে, তা দিয়ে কি আর পুরো বছরের মনের খোরাক জোটে? তবে বুয়েট লাইফের সেই বছরের বইমেলার কথাটিই আজও আমার বেশি মনে পড়ে, যেবার টিএসসি থেকে বাংলা একাডেমির গেট পর্যন্ত দুই ধারের ইনফরমাল স্টলগুলোতে বাজত তপন-শাকিলার নতুন রিলিজ হওয়া অ্যালবামের গানগুলো–'তুমি আমার প্রথম সকাল, একাকী বিকেল, ক্লান্ত দুপুর বেলা', 'পৃথিবীর তিনভাগ জল, একভাগ স্থল আর আমার হৃদয়জুড়ে শুধু তুমি'।

কী করা যায়, কী করা যায় ভাবতে ভাবতেই টিএসসির দেয়ালে দেখলাম আবৃত্তির সংগঠন কণ্ঠশীলনে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তির বিজ্ঞাপন। আবেদনপত্র জমা দিয়ে, সাক্ষাৎকার দিয়ে ভর্তি হয়ে গেলাম। কদিন ভীষণ উপভোগ করলাম গুণী আবৃত্তিকার, উচ্চারণ বিষয়ক পণ্ডিত মীর বরকত, নরেন বিশ্বাস, ড. ওয়াহিদুল হক স্যারদের ক্লাস। এখানেও আরেক জ্বালা, ক্লাস হতো ছুটির দিন শুক্রবার সকালে। ছুটির দিনের কাকডাকা ভোরে শয্যা ছেড়ে অত সকালে নাস্তা করে টিএসসি পর্যন্ত আসতে কারই বা ভালো লাগে? চলতে থাকল শুদ্ধ উচ্চারণ আয়ত্ত করার অনুশীলন।

কোন কিছুই একনাগাড়ে বেশিদিন করতে ভালো লাগত না, হয়তো বয়সটাই ছিল তেমন। তাই কণ্ঠশীলনে শুদ্ধ উচ্চারণের বেসিক কোর্স শেষে অনেকেই যখন সেখানে পরবর্তীতে আবৃত্তির পেছনে ধৈর্য নিয়ে পড়ে থাকল, আমি তখন 'দে-ছুট'। তবে মনে পড়ে বুয়েট সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংসদ প্রতিষ্ঠার পরপরই বুয়েট অডিটরিয়ামে প্রথম আনুষ্ঠানিক লঞ্চিং প্রোগ্রামে ভিসি স্যার, ডিএসডব্লিউ স্যার, মডারেটর স্যার, সংগঠনের সভাপতি, সেক্রেটারির উদ্বোধনী ফরমাল বক্তৃতা-বিবৃতির পরে অসংখ্য দলীয় ও একক নাচ-গান-

আবৃত্তি-নাটকের মাঝে একমাত্র একক আবৃত্তির স্লটটাতে পারফর্ম করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার হল-ভরতি অডিয়েন্সের সামনে; সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'পাহাড় চূড়ায়'। কণ্ঠশীলনের সাম্প্রতিক অনুশীলনের কিছুটা বাস্তবিক প্রয়োগ হলো ভেবে মনে মনে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুললাম। তবে শীতের সেই সকালগুলোতে কণ্ঠশীলনে কি কেবলই শুদ্ধ উচ্চারণের তালিম নিতাম? তাই কি হয়, না-কি করা যায়? আরও কত কিছুরই না তালিম হয়ে গেল সেখানে!

তবে টিএসসিকে কেন্দ্র করে আমার যে অভিযান শুরু হয়েছিল বুয়েটের প্রথম সপ্তাহের পর থেকে তা শামসুন্নাহারের সামনের সড়কদ্বীপ, কণ্ঠশীলন, ডাস, কলাভবন, মধুর ক্যান্টিন, হেয়ার রোডের মায়াভরা পথে ব্রিটিশ কাউন্সিল, আরেকদিকে কার্জন হল, শহিদ মিনার, পাবলিক লাইব্রেরি, শাহবাগ, আজিজ সুপার মার্কেট, আবার কখনো বা নীলক্ষেত-নিউমার্কেট হয়ে কুয়েত মৈত্রী পর্যন্ত বারে বারে ভিন্ন ভিন্ন বাঁক নিয়ে আমার পুরো ভার্সিটি লাইফকেই মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল। আজ যখন পেছন ফিরে দেখি, মাঝে মাঝে ভাবি, তা কি কেবলই ছিল ভবঘুরের মতো উদ্দেশ্যহীন ঘোরাঘুরি যেখান থেকে কোনোই প্রাপ্তি নেই?

পরমুহূর্তেই চোখ বুজে গভীর শ্বাস নিয়ে বুকের মাঝে কিছুক্ষণ ধরে রেখে প্রশ্বাস ছেড়ে সেকেন্ড-থট দিই। তখন মনে হয়, ওই ৫ বছরের (১৯৯৪-৯৯) সেই সময়গুলোতে একটু এদিক-সেদিক ঘোরাঘুরি না করলে আর কীই বা করতে পারতাম? পড়াশুনায় আরেকটু সিরিয়াস, সিজিপিএ আরেকটু বেশি? নাই বা হয়েছে ততটুকু মিস, পেয়েছিও তো কম না সেই ভবঘুরে জীবন থেকে; হরেক রকমের মানুষ দেখেছি, কাজ দেখেছি, মুখোমুখি হয়েছি বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার; কিছু চেয়েছি যা পেয়েছি; কিছু বা চেয়েও পাইনি। আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া আর কিছু বা না পাওয়া নিয়েই তো আমাদের জীবন।

সত্যিই বড্ড বর্ণিল, স্মৃতিঘেরা, অভিজ্ঞতাপূর্ণ, আবেগময় এক সময় আমি উপভোগ করেছি জীবন-বসন্তের সেই উত্তাল দিনগুলোতে, তারুণ্যের যেই অধ্যায়কে আমি উপসংহার টানতেই পারি 'বুয়েট থেকে টিএসসি' বলে। পারি না-কি?

## পুরনো ইতিহাস ফিরে এলে লজ্জা কি তুমি পাবে না, ও বন্ধু?

রাজ্জাক-কবরী, আলমগীর-শাবানা, জাফর ইকবাল-ববিতা যুগের পরে সম্ভবত ১৯৯১ সালে ঢালিউডের ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে অনেকদিনের ব্যবধানে প্রথম নতুন তরুণ জুটি এলো শাবনাজ-নাইম তাদের প্রথম সিনেমা *চাঁদনী*তে। সে কী ক্রেইজ!

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে দীর্ঘদিন যাবৎ পুরনো একই মুখ দেখতে দেখতে ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত বাংলার সিনেমাপ্রেমী দর্শকরা যেন হালে পানি পাইল অনেকটা 'পাইলাম, আমি ইহাকে পাইলাম'-এর মতো। যদিও নাইম, শাবনাজ মোটেও ভালো অভিনেতা-অভিনেত্রী ছিল না। এ যেন ছিল অনেকটা একঘেয়ে জীবনে নতুন কোনো বৈচিত্র্যের স্বাদ আস্বাদনের মতো তা সেটা যেমনই হোক না কেন।

আমরা তখন ঢাকা কলেজে পড়ি, থাকতাম ক্যাম্পাসের মধ্যেই কলেজের হোস্টেলে। উত্তরবঙ্গের একটি জেলা থেকে স্কুলের গণ্ডি পেরিয়ে নগরবাড়ি-আরিচা রুটে উত্তাল যমুনা নদী ফেরীতে পাড়ি দিয়ে লম্বা বাস জার্নি করে ঢাকায় এসে ঢাকা কলেজে ভর্তি হয়ে ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে কলেজ ক্যাম্পাসের হোস্টেলে থাকার সময় জানলাম, বাংলাদেশের শতাব্দীপ্রাচীন এই ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেবল ভালো ছাত্রদেরই শিক্ষাঙ্গন নয়; এখানে বড় বড় হ্যাডমওয়ালা মাস্তানও গড়ে ওঠে।

আমরা সেসময় সবচেয়ে বেশি শুনতাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কাঁপানো ছাত্রদলের দুর্ধর্ষ ক্যাডার গোলাম ফারুক অভির নাম যিনি পরবর্তীতে বরিশালের একটি আসনে জাতীয় পার্টি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৯৬ সালে। বাই দ্য ওয়ে, অভি ভাই কিন্তু যশোর বোর্ডে এসএসসিতে দ্বিতীয় স্থান (সম্ভবত মানবিক বিভাগে) অধিকার করে ঢাকা কলেজে এইচএসসি পড়ার জন্য ভর্তি হয়েছিলেন এবং উনার সকল ভাইবোনই ছিলেন অত্যন্ত স্কলার।